২০

# পরিবেশ রসায়ন

## ভূমিকা

একবিংশ শতাব্দির দারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষগুলো। ঠিক এমনি সময়ে সরব খবর উঠেছে ও জোর আলোচনা চলছে-"ভঙ্গুর ও বিপন্ন" এ পৃথিবীকে নিয়ে। প্রায় ৫০০ কোটি বছরের পুরাতন এ গ্রহে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটছে সতত। এর কতগুলো পরিবর্তন বিপরীতমূখী পরিবর্তনযোগ্য। আবার কতগুলো পরিবর্তনের ফলে যেমন গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোনস্ড়রের লয় প্রভৃতির জন্য মানব জাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে বেশ শংকার জন্ম হচ্ছে।

পৃথিবীর পরিবেশ ভারসাম্য সূদীর্ঘকাল ধরে বজায় ছিলো। পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিবেশের সাথেও খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে দেখা গেছে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে। প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারনে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব ও বিলুপ্তি ঘটেছে।

পৃথিবীতে প্রাণ বাঁচার কারণ হচ্ছে পৃথিবীতে রয়েছে প্রচুর বায়ু আর পানির সরবরাহ। আর রয়েছে এখানকার তাপমাত্রা যেটা জীবন্ত জিনিসের (living thing)বাঁচার জন্য খুবই উপযোগী। এ পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, গাছপালা, মাটি এবং সূর্যের আলো থেকে প্রতিদিন মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে আসছে। এদের কোনটার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটলে পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আজকাল আমরা একটি বিষয়ে অনেকেই অবগত আছি সেটা হচ্ছে দূষণ (pollution)। কিন্তু এই দূষণ কি? এর জন্য কে দায়ী? দূষণ হচ্ছে এমন একটা জিনিস বা ঘটনা যা পরিবেশের (environment) ক্ষতি সাধন করে। প্রকৃতি ও মানব সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন দূষণ আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের নিয়মকে (ecological system) নষ্ট করে দেয়। এটা একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলে যা পৃথিবীর গাছপালা ও প্রাণিকুলের জন্ম এবং বৃদ্ধির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে, যথা- বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি। এ ইউনিটে বিভিন্ন দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

# পাঠ ১ পরিবেশ দূষণ

## ভূমিকা

মানুষ, জীব-জন্তু, বন-বৃক্ষ, তাজমহলের মত বিখ্যাত স্থাপনা প্রভৃতির স্থায়িত্ব প্রধানত নির্ভর করে পরিবেশের উপর। পরিবেশ অনুকুল হলে সব কিছুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রতিকুল পরিবেশে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না। এই পাঠে প্রতিকুল পরিবেশ বা পরিবেশ দূষণ আলোচনা করা হবে।

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে

- পরিবেশ দূষণ কি তা জানা যাবে।
- পরিবেশ দূষণে শিল্প ও মানুষের ভূমিকা বর্ণনা করা যাবে।
- পরিবেশ দূষণের উদাহরণ উলে- খ করা যাবে।

## পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষণ আলোচনার পূর্বে আমরা জেনে নেই পরিবেশ বলতে কি বুঝায়? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সব কিছু মিলেই হচ্ছে পরিবেশ। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে পৃথিবীর সবকিছু তথা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্ড়র পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত পরিমন্ডলের বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানবনির্মিত অবকাঠামো এবং গোটা উদ্ভিদ ও জীবজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাকে পরিবেশ বলে। পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন (৪৫০ কোটি) বছরের কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবে আরও ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন তথা ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর পৃথিবীর টিকে থাকার কথা। সে সময় সূর্য তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানী নি:শেষ করে ফেলে প্রসারিত হবে এবং পৃথিবীসহ তার চারপাশের সব গ্রহ ভস্মীভূত করে ফেলবে। অন্যদিকে মানব সৃষ্ট পারমাণবিক মহাযুদ্ধ স্বল্প সময়েই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। আর এ দুই চরম অবস্থার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর আয়ু। কেবলমাত্র পদার্থ বিদ্যার সূত্র দ্বারা পৃথিবীর আয়ুষ্কাল নির্ণয় সম্ভব নয়, মানুষের কর্মকান্ডও এর উপর উলে- খযোগ্য প্রভাব ফেলছে এবং বর্তমানকালে তা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মূলত: পৃথিবীতে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের কর্মকান্ডই পৃথিবীকে ও পৃথিবীর পরিবেশকে প্রাণী বসবাসের অনুপোযোগী করে তুলছে অর্থাৎ পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে।

পানি, বাতাস ও মাটিসহ পরিবেশের কোন উপাদানের যখন এমন কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, জীবজগতের উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়।

পরিবেশ দূষণের জন্য যে সমস্ত জিনিস বা পদার্থ দায়ী তাদেরকে দূষক (pollutants) বলা হয়। দূষকসমূহ যে পরিবেশেই থাকুক না কেন, এদেরকে মূলত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) শক্তি বিষয়ক দূষকসমূহ (যেমন- শব্দ, তাপ ও তেজষ্ক্রিয় বিকিরণ)

(খ) রাসায়নিক পদার্থসমূহ (যেমন- জৈব ও অজৈব, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থ)

(গ) জীবসমূহ (যেমন- বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীসমূহ)।

প্রধানত দু'টি কারনে পরিবেশ দূষিত হয়, যথা-

১। প্রাকৃতিক কারণ এবং

২। মানুষের কর্মকান্ড জনিত কারণ।

পরিবেশের দূষণের প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, বন্যা, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদি অন্যতম। পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ মানব সৃষ্ট কর্মকান্ড। পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন, অসংগতিপূর্ণ নগরায়ন, জমির অধিককর্ষণ, জমিতে অধিক হারে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার, শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, আবাসিক এলাকায় শিল্পকারখানার অবস্থান, শিল্প দূর্ঘটনা, জ্বালানীসহ অন্যান্য প্রয়োজনে অধিক হারে বৃক্ষনিধন, অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র, অশিক্ষা, যানবাহনের কালো ধোয়া ও জোরালো শব্দের হর্ন, উপযুক্ত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, অতিমাত্রায় প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, ইত্যাদি সবকিছু মিলে পরিবেশকে দূষিত করছে এবং সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণ ধীর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মত খুব আস্তে অথবা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে পারে। এর ফলাফল অত্যন্ত ক্ষতিকর, যা অনেক সময় স্থায়ী রুপ ধারণ করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৮৫ সালে ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজধানী ভূপালে মার্কিন প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন কার্বাইডের রাসায়নিক কারখানা থেকে বিষাক্ত মিথাইল আইসোসায়ানাইড গ্যাস নির্গমনের ঘটনা এবং ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেনের চেরনোবিলের পারমাণবিক চুল্লীর বিস্ফোরণজনিত প্রতিক্রিয়ায় ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ। ভূপালের দূর্ঘটনায় আড়াই হাজার লোক মারা যায় এবং প্রায় দু'লক্ষ লোক বিষক্রিয়ার শিকার হয়। এদের অনেকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে। অন্যদিকে চেরনোবিলের দূর্ঘটনায় ইতোমধ্যে একত্রিশ জন মারা গেছে এবং প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছে। তেজস্ক্রিয়তা বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারসহ অন্যান্য জটিল রোগ-ব্যধির সৃষ্টি করে। চেরনোবিলে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত এ সাড়ে তিন লক্ষ লোকের অনেকেই অদূরভবিষ্যতে মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে চলেছে। দূর্ঘটনার দু'দশক অতিক্রম হলেও এখনও চেরনোবিল ও তার আশেপাশের জমি আবাদযোগ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে চেরনোবিল দূর্ঘটনার ফলে গোটা উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কৃষিজমি ও কৃষিপন্য দূষিত হয়েছিল এবং এর প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী।

বিশ্বের অন্যতম জনবহুল মহানগরী মেক্সিকো সিটিতে প্রায় দু'কোটি লোকের বাস, পরিবেশ দুষণের কারনে এ মহানগরী বর্তমানে বিপর্যয়ের সম্মুখীন। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মোটরগাড়ি এবং প্রায় পয়ত্রিশ হাজার শিল্প-কারখানা নির্গত বর্জ্যে নগরীর পরিবেশ ব্যাপক মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়ায় নগরবাসীরা প্রায়ই মাথাব্যাথা, স্বাসকষ্ট, চোখ জ্বলাপোড়া, মাথা ঝিম ঝিম করা ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। দূষণের কারনে নগরবাসীদের মধ্যে ক্যান্সার ও হৃদরোগের আশংকা বেড়েছে, শিশুদের জ্ঞানার্জনে অক্ষমতা ও স্বাভাবিক মানসিক বিকাশেও বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রধান শহরগুলির মধ্যে রাজধানী ঢাকার পরিবেশ দূষণ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। গাড়ীর নির্গত সীসা মিশ্রিত কালো দোয়া ঢাকার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্যানারী থেকে নি:সৃত বর্জ্যে পার্শ্ববর্তী নদী বুড়িগগঙ্গার পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে, ফলে নদীতে মাছসহ অন্যান্য জলজ জীব বিলুপ্ত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বহুল প্রসারিত গারমেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সহায়ক ডাইং ইন্ডাস্টির বর্জ্য পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।

## সারসংক্ষেপ

- আমাদের চারপাশের সবকিছু তথা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানবসৃষ্ট অবকাঠামো এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত সমন্বয়ে যা সৃষ্ট, তাকে পরিবেশ বলে।
- পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- পানি, বায়ু, মাটি ইত্যাদি) যখন এমন কোন ভৌত রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সঙ্গে সঙ্গে বা পরবর্তীতে জীবজগতের উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন এ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।
- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামী ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারনে পরিবেশ দূষিত হয়, তবে মূলত মানুষের কর্মকান্ডে পরিবেশ বেশি দূষিত হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। পৃথিবীর বর্তমান বয়স কত?

ক) প্রায় 450 কোটি বছর
খ) প্রায় 500 কোটি বছর।
গ) প্রায় 400 কোটি বছর
ঘ) প্রায় 550 কোটি বছর।

২। ভারতের ভূপালে কত খ্রিস্টাব্দে রাসায়নিক কারখানায় দূর্ঘটনা ঘটে?

ক) 1980 খ্রিস্টাব্দে
খ) 1990 খ্রিস্টাব্দে
গ) 1985 খ্রিস্টাব্দে
ঘ) 1986 খিস্টাব্দে

৩। চেরনোবিল দুর্ঘটনায় কত লোক তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছে?

ক) প্রায় দু'লক্ষ
খ) প্রায় আড়াই লক্ষ
গ) প্রায় তিন লক্ষ
ঘ) প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ

### রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন:

১। পরিবেশের সংজ্ঞা লিখুন।

২। পরিবেশ দুষণ বলতে কি বুঝায়? পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৩। বিগত আশির দশকে সংঘটিত দু'টি মারাত্নক পরিবেশ দূষণের উল্লেখ করুন।

৪। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের পরিবেশ দুষণের কারণ উল্লেখ করুন।ঢাকা শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হলে কি করা প্রয়োজন?

# পাঠ ২ বায়ু দূষণ

## ভূমিকা

জীব জগতের প্রায় ৯৯% জীব বায়ুজীবি। মানুষ সহ সকল বায়ুজীবি প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ূ গ্রহণ করে আবার তা পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। পরিবেশের অন্যান্য উপাদান যেমন; গাছ-পালা মানুষের ফিরিয়ে দেয়া বাতাসকে পরিশোধিত করে মানুষের পূণ:ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। এভাবে অনন্তকাল ধরে বায়ু দূষণমুক্ত আছে। তবে সম্প্রতিকালে অস্বাভাবিক হারে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠা এবং গ্যাসোলিন চালিত যানবাহনের সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বায়ু মানুষের ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে মানুষ শ্বাসকষ্ট সহ নানা অসুখে ভুগছে। এই পাঠে বায়ু দূষণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে

- বায়ু দূষণের কারণগুলি উল্লেখ করা যাবে।
- গ্রীন-হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোনস্তরের লয় বর্ণনা করা যাবে।
- বায়ু দূষণের হাত থেকে রক্ষার উপায় বর্ণনা করা যাবে।
- বায়ু দূষণের ফলাফল বর্ণনা করা যাবে।

## বায়ু দূষণ

## Air pollution

ভূ-পৃষ্ঠের উর্দ্ধে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত। বায়ুমন্তল আসলে বিভিন্ন ধরনের গ্যাসের সংমিশ্রণ, এদের মধ্যে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডই প্রধান। এছাড়াও বায়ুমন্ডলে রয়েছে নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, হাইড্রোজেন, ওজোন প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্যাস।

বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসসমূহ একটি নির্দিষ্ট হারে থাকে যা মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু বায়ুমন্ডলে এসকল গ্যাসসমূহ, বিভিন্ন কারনে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছে গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সে অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। মানুষের হস্তক্ষেপের ফলে বা প্রাকৃতিক কারনে বায়ু দূষক পদার্থের হ্রাস, বৃদ্ধি বা অনুপ্রবেশ ঘটে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণসহ দূর্ঘটনাজনিত তেজস্ক্রিয় নির্গমণ, কলকারখানা নির্গত বিষাক্ত ধোয়া, যানবাহন নির্গত ধোঁয়া, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় পৌর ও গৃহস্থালীর আবর্জনা জমানো ও অপসারণ, যথেচ্ছা বৃক্ষনিধন, ব্যাপক কয়লা ও কাঠ পোড়ানো, অতিরিক্ত অ্যারোসল ও অন্যান্য স্প্রে ব্যবহার এবং কৃষিকাজ ও মশামাছি নিধনে ব্যবহৃত রাসায়নিক কীটনাশক ইত্যাদি কারনে বায়ুদূষণ ঘটছে।

## বায়ু দূষণের কারণ

নানাবিধ কারনে বায়বীয় পরিবেশ দূষিত হতে পারে। নিচে বায়ু দূষণের কারণগুলি উলে- খ করা হলো-

### ১। যানবাহনের পরিত্যক্ত গ্যাসঃ

শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণের প্রধান উপাদান হচ্ছে যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাস। শতকরা ৬০ ভাগ বায়ু দূষণ ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া দ্বারা হয়ে থাকে। এ ধোঁয়ায় কার্বন মনো-অক্সাইডের (CO) এর সাথে থাকে নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO), লেড অক্সাইড, সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড, হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। ডিজেল দহন অপেক্ষা পোট্রোল দহনে এ সকল গ্যাস বেশি নির্গত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রতি 1000 গ্যালন পেট্রোল দহনের ফলে গড়ে প্রায় 3000 পাউন্ড কার্বন মনো অক্সাইড, 300 পাউন্ড জৈব বাষ্প, 50

পাউন্ড নাইট্রোজেন অক্সাইড, 18 পাউন্ড অ্যালডিহাইড, 17 পাউন্ড সালফার যৌগ, 2 পাউন্ড জৈব এসিড এবং 0.3 পাউন্ড কার্বন উৎপন্ন হয়।

**২। ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা [smoke and smog (smoke+fog)]**

কলকারখানার চিমনি, রান্নার উনুন ও যানবাহনের পাইপ থেকে ডিজেল, পেট্রোল, কয়লা, কেরোসিন, গ্যাসোলিন প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহনের ফলে ধোঁয়া নির্গত হয়। ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোর সময় এবং রাস্তা তৈরি ও মেরামতকালে পীচ ও বিটুমিন গলানোর ফলে নির্গত ধোঁয়া পরিবেশকে দূষিত করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত বায়ু ও ধোঁয়া যখন একসঙ্গে মিশে মেঘের মত ঘন কালো হয় তখন তাকে ধোঁয়াশা বলে।

শিল্পাঞ্চলের ধোঁয়াশা পরিবেশে এক বিশেষ ক্ষতিকারক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ধোঁয়াশায় পরিণত হয় যা জীবের পক্ষে আরও ক্ষতিকর, একে আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা ফটোকেমিক্যাল স্মগ (Photochemical smog) বলে।

ধোঁয়াশার সাথে যানবাহন ও কলকারখানা থেকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য যেসব পদার্থ নির্গত হয়, তার মধ্যে রয়েছে সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি।

**৩। ধূলিকণা (Dust particles)**

অনেক কলকারখানা (যেমন- পাটকল, বস্ত্রকল, সিমেন্টের কারখানা ইত্যাদি) থেকে নির্গত ধূলিকণা বায়ু দূষণ ঘটায়।

**৪। তেজস্ক্রিয় পদার্থঃ**

বর্তমানকালে বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো শক্তি পরীক্ষায় নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ এসব তেজস্ক্রিয় ভস্মের কণাগুলির দ্বারা মানুষের বিভিন্ন মারাত্মক রোগ, দেহের বিকৃতি ইত্যাদি দেখা দিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ব্যবহৃত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলাফল এখনও বর্তমান।

**৫। আয়নাইজিং বিকিরণঃ**

তেজস্ক্রিয় মোলসমূহ উচ্চশক্তির বিকিরণ ঘটায়, এর ফলে স্থিতিশীল পরমাণু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এ ধরনের বিকিরণকে আয়নাইজিং বিকিরণ বলে। এসব মৌলিক পদার্থের যেসব বিকিরণ ঘটায় তাদেরকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা রেডিওঅ্যাকটিভ রে (radioactive ray) বলে। এ বিকিরণ প্রধানত তিন প্রকার যথা– আলফা, বিটা ও গামা বিকিরণ।

**৬। কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ব্যবহারঃ**

ফসলের কীটপতঙ্গ, ছত্রাক দমনে রাসায়নিক কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে ডিডিটি (DDT, হেপ্টাক্লোর, অ্যালড্রিন, ক্লোরোডেন, ডাইমেক্সন, ডায়াজিনন, ফুরাডান, বাসুডিন ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। এ সমস্ড় কীটনাশক কৃষিক্ষেতে ছিটানোর সময় বায়ু দূষিত হয়।

**৭। সূক্ষ্ম কণাঃ**

এগুলি হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং মানুষ তৈরি উৎস থেকে সৃষ্ট ভাসমান ক্ষুদ্রকণা। এ ক্ষুদ্রকণাগুলিকে বায়ুতে কঠিন অথবা তরল অবস্থায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। এরা বায়ুতে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাসতে থাকে এবং বায়ুকে দূষিত করে।

মানুষের কিছু দৈনন্দিন কাজ যেমন- ছিদ্র করা, রং স্প্রে করা, কৃষি কাজ, নির্মাণ কাজ ইত্যাদির সময় বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র কণা বায়ুমন্ডলে যুক্ত হয়। এছাড়া কলকারখানার চিমনি থেকে বিভিন্ন ধাতব কণা যেমন- জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, লেড প্রভৃতি বের হয়ে বায়ুতে মিশ্রিত হয়।

## গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোন স্তর লয়ঃ

### গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green house Effect)

আধুনিক যুগের মানুষ জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে কৃষি কাজে, শিল্প ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য কাজে বেশ কিছু রাসায়নিক ও জীব-রাসায়নিক কার্যাদি সম্পন্ন করে। এর ফলে বেশ কিছু গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$), মিথেন ($CH_4$), নাইট্রোজেনঅক্সাইড ($N_2O$), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি (CFC), ওজোন ($O_3$) এবং জলীয় বাষ্প ইত্যাদি বর্ধিত হারে উৎপন্ন হয়ে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে এদের বায়ুমন্ডলীয় ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলছে। এগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্মিলিত প্রভাবই "গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া" নামে পরিচিত।

গ্রীন হাউজ কথাটা বোঝার জন্য শীত প্রধান দেশে কাঁচের ঘরে শব্জী চাষের প্রক্রিয়াটি বোঝা দরকার। কাঁচের ঘরের ছাদ ও দেওয়াল আলোক স্বচ্ছ হওয়ায় সুর্য রশ্মির দৃশ্যমান আলো সহজেই প্রবেশ করে। ঘরের ভেতর প্রবেশ করার পর সুর্যরশ্মির ছোট ছোট তরঙ্গগুলো শোষণ, প্রতিফলন এবং অন্যান্য মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাপরশ্মির বড় তরঙ্গে পরিণত হয় (ইনফ্রারেড তরঙ্গ) এবং ঘরের ছাদ ও দেওয়ালে আটকা পড়ে।

সূর্য রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে অনায়াসে আসতে পারলেও পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত রশ্মি বিভিন্ন গ্যাসের সাহায্যে বায়ুমন্ডলে শোষিত হয় বা প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ফেরত আসে। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠ যতটুকু উত্তপ্ত থাকার কথা তার চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হচ্ছে।

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফস্তর বিগলিত হবে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এর ফলে আগামী 50-100 বছরের মাঝে বাংলাদেশের প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ সমুদ্রের পানির নিচে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

### ওজোন স্তর লয় (depletion of ozone layer)

পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরের স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনের একটি হালকা আবরণ রয়েছে। এই আবরণ ক্ষতিকর UV রশ্মি শোষণ করে বলে পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণি ও উদ্ভিদ এই রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পায়। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে আন্টার্কটিকের বায়ুমন্ডলের উপরের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বসন্তকালে ওজোন স্তরে গহবর সৃষ্টি হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে সিএফসি নামক এক শ্রেণীর যৌগ ওজোন স্তর বিনাশের জন্য মূলত দায়ী। সিএফসি ফ্রিজ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। সিএফসি বায়ুমন্ডলের উপরের স্তরে UV রশ্মির প্রভাবে ভেংগে সক্রিয় ক্লোরিন উৎপন্ন করে।

$$\text{সিএফসি} \xrightarrow{\text{UV রশ্মি}} \text{সক্রিয় ক্লোরিন।}$$

এই ক্লোরিন অনুঘটকীয় শৃংখল বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজোন স্তর বিনাশ করতে পারে। 1.0 অণু সিএফসি হাজার হাজার ওজোন অণুর বিনাশে অংশ নিতে পারে। ওজোন স্তরের বিনাশের ফলে ক্ষতিকর UV রশ্মি অধিক হারে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছবে বলে ফর্সা লোকদের ত্বকের ক্যান্সার ও চোখের ছানি পড়াসহ বিভিন্ন রোগ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও এর ফলে উদ্ভিদ ও জীব-জগতের অনেক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটতে পারে।

মন্ট্রিল ও মন্ট্রিল পরবর্তী বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে সিএফসি এর উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে ওজোন স্তরের লয় রোধ সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

## বায়ু দূষণের ফলাফলঃ

১। অটোমোবাইল ও কল-কারখানা হতে নির্গত কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস শরীরে ঢুকে রক্তের লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে মিশে কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে। ফলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এতে শ্বাস ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে। এছাড়া এ গ্যাসটি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের সংযোজন পদ্ধতিতে বাধা দান করে।

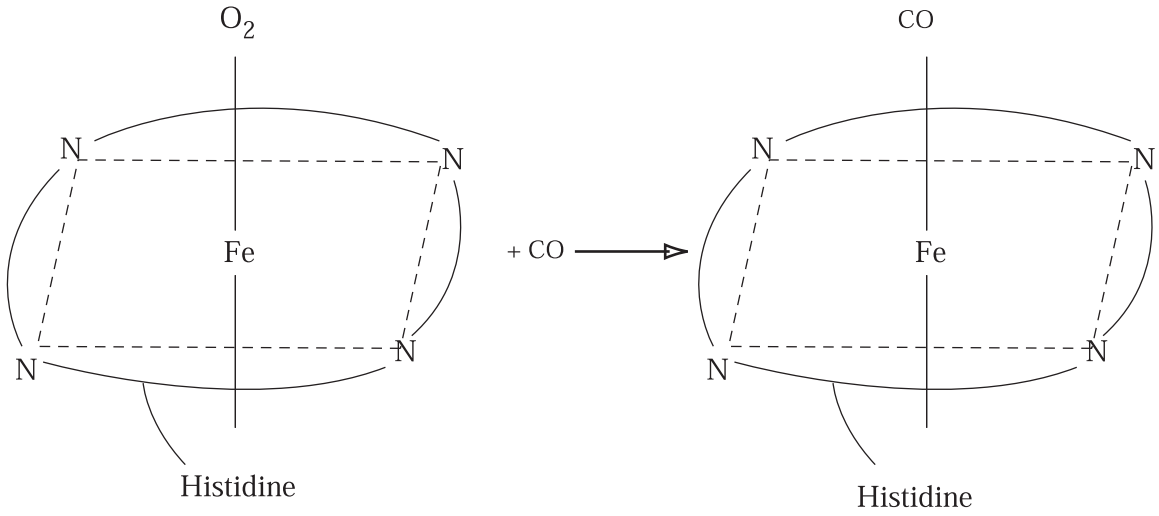


হিমোগ্লোবিন অণুর একটি অংশের কার্বোক্সি হিমোগ্লোবিনে রূপান্তর

২। মোটরযান, কলকারখানা, তেল শোধনাগার, বৃহৎ তৈলাধার ইত্যাদির ব্যবহৃত জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনের ফলে নির্গত হাইড্রোকার্বন যকৃতের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

৩। বায়ু দূষক নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড-এর প্রতিক্রিয়ায় ফুসফুস ফুলে যায় এবং কিছুদিন পরে ঈডিমা (Eedima) বা ফুসফুসে পানি জমা রোগে মৃত্যু ঘটে। এ গ্যাসটি উদ্ভিদের জন্যও ক্ষতিকর।

৪। পারমাণবিক বিস্ফোরণে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা ক্যান্সার রোগের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। এর ফলে মানসিক ভারসাম্যহীন ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম হতে পারে।

৫। পানির সাথে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ($NO_2$) এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড ও নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়। নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে এসিড বৃষ্টি হয়ে। এসিড বৃষ্টির ফলে উদ্ভিদ ও জলচর প্রাণীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একইভাবে সালফারের বিভিন্ন অক্সাইড থেকে সবশেষ সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড বৃষ্টি হিসেবে নিচে নেমে আসে।

৬। সালফার ডাই-অক্সাইড বিভিন্ন ফসল (যেমন- তুলা, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি)-এর ক্ষতি করে থাকে। ফলে কোন এলাকায় ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদ অঞ্চলের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

৭। বিভিন্ন ধাতব পদার্থ (যেমন- সীসা, দস্তা, লোহা, পারদ প্রভৃতি) মানুষের নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা এসকল ধাতব পদার্থের প্রধান শিকার।

৮। বাতাসে অবস্থিত ক্ষুদ্রকণা মানুষের ফুসফসের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে।

## বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণঃ

বায়ু দূষণের প্রধান কারণ জীবাশ্ম জ্বালানী পোড়ান। নিচে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা হলো-

১। জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার সীমিতকরণ।

২। যে সমস্ড় জ্বালানী অল্প দূষণ সৃষ্টি করে তাদের ব্যবহার। যেমন- গ্যাসোলিনের পরিবর্তে অ্যালকোহল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩। কল-কালখানার চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়াতে সালফার এবং অন্যান্য দূষক থাকে, এ দূষকগুলিকে বাতাসে মিশে যাবার আগে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। এটা করা হয় গ্যাস পরিশোধনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। একে স্ক্র্যাবার (scruber) বলে।

৪। গাড়িতে ক্যাটালাইটিং কনভাটার স্থাপন করে। এই ক্যাটালিক কনভাটার ক্ষতিকর কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন গ্যাসগুলিকে পরিবর্তিত করে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানিতে পরিণত করে।

৫। গাছ-পালা ধ্বংস বন্ধ করে। গাছ-পালা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে।

৬। জ্বালানীবিহীন যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যেমন- শহর এলাকার বাই-সাইকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি করে পরিবেশ দূষণ কমানো সম্ভব।

৭। সৌরশক্তির ব্যবহার: জ্বালানী নির্ভর শক্তির পরিবর্তে সৌর শক্তি ব্যবহার করা হলে পরিবেশের দূষণ কমে যাবে।

## সারসংক্ষেপ

- বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের উপস্থিতি বিদ্যামান এদের মধ্যে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড অন্যতম।
- বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসসমূহ একটি নির্দিষ্ট হারে থাকে, যা মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- বায়ু দূষণের প্রধান কারণ জীবাস্ম জ্বালানী পোড়ানো। এ কারনে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ভূ-পৃষ্ঠের কত কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত?
ক) 200 কিলোমিটার
খ) 250 কিলোমিটার
গ) 300 কিলোমিটার
ঘ) 350 কিলোমিটার

২। ডিজেল ও পেট্রোল চালিত যান-বাহনের ধোঁয়া থেকে শতকরা কত ভাগ বায়ু দূষণ ঘটে?
ক) 60 ভাগ
খ) 50 ভাগ
গ) 70 ভাগ
ঘ) 55 ভাগ

৩। গাছ-পালা পরিবেশ থেকে কোন গ্যাস শোষণ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে?
ক) NO
খ) $NO_2$
গ) $CO_2$
ঘ) $SO_2$

**রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন**

১। বায়ু দূষণ বলতে কি বুঝায় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২। বায়ু দূষণের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৩। গ্রীন হাউস প্রভাব কি? এর ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করুন।
৪। ওজন স্তরের লয় বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৫। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াগুলি উল্লেখ করুন।

## পাঠ ৩ পানি দূষণ (Water pollution)

**ভূমিকা**

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া জীবন বাঁচতে পারেনা। তবে দূষিত পানি মানুষের তথা জীব জগতের জন্য ক্ষতিকর। পানি নানাভাবে দুষিত হচ্ছে। এই পাঠে পানি দূষণ আলোচনা করা হবে।

**উদ্দেশ্য**

এ পাঠ শেষে

- পানি দূষণ কি ও কেন হয় তা উলে- খ করা যাবে।
- এ দুষণের ফলাফল বর্ণনা করা যাবে।
- এর প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

## পানি দূষণ (Water pollution)

পৃথিবীর শতকরা প্রায় সাতানব্বই ভাগ পানিই সাগরের। অবশিষ্ট মাত্র তিন ভাগ পানি মিঠা পানি। আবার এ তিন ভাগের মাত্র এক তৃতীয়াংশ মানুষের আওতাধীন, বাকীটা মেরু অঞ্চল ও হিমাবাহের বরফে রুপান্তরিত। তবুও এ পরিমাণ মিঠা পানি পৃথিবীর সকল মানুষের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। কিন্তু অসম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও পানি দুষণের কারনে মানুষ তার প্রাপ্য পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

পানির ব্যবহার ব্যাপক ও সর্বত্র। আমরা পানি ব্যবহার করে থাকি তৃষ্ণা মেটাতে, পরিষ্কার করার কাজে, চাষাবাদের কাজে, শক্তির উৎস হিসেবে এবং আরো অনেক কাজে। নদী-নালা এবং পুকুর হচ্ছে আমাদের মিঠা পানির প্রধান উৎস। বিভিন্ন কারনে পানি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়তে পারে। মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নিরাপদ নয়, পানির এমন অবস্থাকে পানিদূষণ বলা হয়।

পানি দূষণ বিভিন্ন কারনে হতে পারে। যে সমস্ত উপাদানের উপস্থিতিতে পানি দূষণ ঘটে তাদেরকে পানি দুষক বলে। যথা:

### ১। জৈব আবর্জনা

শহর বা গ্রামের ঘরবাড়ি ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা এবং শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত প্রাণী ও উদ্ভিদজাত আবর্জনাগুলো হচ্ছে জৈব আবর্জনা। সবচেয়ে বেশি শিল্পজাত জৈব আবর্জনা নির্গত হয় চিনি, খাবার, মন্ড, কাগজ ও চামড়ার কারখানা থেকে। ঐ সকল জৈব পদার্থ পার্শ্ববর্তী জলাধার ও নদ-নদীর পানিকে দুষিত করে।

### ২। জীবাণুসমূহ

মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস ও অন্যান্য জীবাণু গৃহস্থালীর পরিত্যক্ত বর্জ্য, রোগীর মলমূত্র, বিভিন্ন শিল্প কারখানার (যেমন- চামড়ার কারখানা, কসাইখানা ইত্যাদি) বর্জ্যের সাথে মিশে থাকতে পারে। পরে এ সমস্ত বর্জ্য পদার্থ পুকুর, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাশয়ের পানিতে মিশে পানি দূষণ ঘটায়।

### ৩। উদ্ভিদের উপাদানসমূহ

নাইট্রোজেন ও ফসফরাস উদ্ভিদের দু'টি মুখ্য পুষ্টি উপাদান। এ পুষ্টি উপাদান দুটি নাইট্রেট ও ফসফেট আকারে মাটিতে থাকে এবং পানির সাথে মিশে পানি দূষণ ঘটায়। গৃহস্থালীর ময়লা আবর্জনা, শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ, রাসায়নিক সার মিশ্রিত পানি, নাইট্রেটযুক্ত খনিজ পদার্থ ইত্যাদি জলাশয়ের পানিতে মিশে পানিতে নাইট্রেট ও ফসফেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পানিতে এ পুষ্টি উপাদানের আধিক্য হেতু শৈবাল ও আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ প্রচুর জন্মে এবং পানিতে পঁচে পানি দূষণ ঘটায়। পানিতে এ সকল উদ্ভিদের অতিমাত্রায় বৃদ্ধিকে ইউট্রফিকেশন বলে।

### ৪। কৃত্রিম জৈব পদার্থসমূহ

পানি দুষণকারী বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম জৈব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য, সাবান, কীটনাশক, অন্যান্য কৃত্রিম রাসায়নিক বর্জ্য এবং এসব দ্রব্য প্রস্তুতকারী কারখানার বর্জ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

### ৫। অজৈব রাসায়নিক পদার্থ

বিভিন্ন ধাতু, ধাতব লবণ, এসিড, নানান কৃত্রিম অজৈব রাসায়নিক পদার্থ ও এগুলির উপজাতসমূহ অজৈব রাসায়নিক পদার্থ হিসেবে পরিচিত। পানি দূষক ধাতব পদার্থের মধ্যে সীসা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, পারদ, তামা, রুপা, ভানাডিয়াম ও মলিবডেনাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে পারদ ও সীসা মারাত্মক মাত্রার দূষক। খনি ও কলকারখানার ময়লা আবর্জনা, তৈল উত্তোলন ও পরিশোধন ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি উৎস থেকে বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিক পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দুষিত করে।

### ৬। পানিবাহিত পলি ও তলানি

কোন স্থানের ভূমি ক্ষয়, পাহাড় ধস ও শক্ত আবরণে আচ্ছাদিত স্থান থেকে ধোয়া মাটি, বালুকণা ইত্যাদি পলি হিসেবে ব্যাপকভাবে পানি দূষণ ঘটায়। এতে পানি দূষণের পাশাপাশি তলানী সৃষ্টির ফলে নদ-নদী ভরাট হয়ে যায়।

### ৭। তেজস্ক্রিয় পদার্থ

তেজস্ক্রিয় পদার্থ কঠিন, তরল বা বায়বীয়-এর যে কোন অবস্থাতেই পানি দূষণ ঘটায়। তেজস্ক্রিয় ধাতু পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থের শোধন কেন্দ্র, পারমাণবিক চুল্লী, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণজনিত বায়ুবাহিত তেজস্ক্রিয় বস্তুকণা, পারমাণবিক দূর্ঘটনা, পারমাণবিক বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত অপসারণ ইত্যাদি দ্বারা পানি দূষণ ঘটে।

### ৮। গরম পানি

পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা, তেল শোধনাগার, পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা ও অন্যান্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ঠান্ডা রাখতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক পানি ব্যবহার করা হয় এবং ব্যবহৃত পানি উত্তপ্ত অবস্থায় পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরে আসে, ফলে তাপ দূষণের মাধ্যমে পানি দুষিত হয়ে পড়ে।

### ৯। তেল

সমুদ্র ও নদ-নদীতে বিশেষ করে নৌ-বন্দরগুলিতে বিভিন্ন জলযান এর মাধ্যমে তেল পরিবহণ ও স্থানান্তরের সময়, তেল উত্তোলক প্লাটফর্ম থেকে বা বিভিন্ন দুর্ঘটনায় জলযান থেকে তেল পানিতে পড়ে পানি দুষণ ঘটায়।

## পানি দূষণের ফলাফল

নিচে পানির দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব তথা ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

১। পানিতে পচনশীল জৈব পদার্থের পরিমাণ যত বেশি হয়, সেগুলিকে বিশ্লিষ্ট (decompose) করার জন্য তত অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন হওয়ায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়, যা জলজ প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এমতাবস্থায় জলজ জীবের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

২। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু দ্বারা দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে মানুষের কলেরা, টাইফয়েড, ডাইরিয়া, আমাশয়, পরিপাকতন্ত্র প্রদাহ, যকৃত প্রদাহ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়।

৩। পানিতে অধিক পুষ্টি উপাদানের (উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান) উপস্থিতিতে শৈবাল ও অন্যান্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ ব্যাপক হারে জন্মায় এবং এদের পচনের ফলে পানি দূষিত হয়। এভাবে পানির দূষণে জলজ প্রাণীর বাসের অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়, এমনকি জলজ প্রাণীর মৃত্যুর ঘটতে পারে।

৪। কৃত্রিম জৈব পদার্থ দ্বারা দূষিত পানি শিশু, সংবেদনশীল উদ্ভিদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে জলজ প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

৫। দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তনশীল কীটনাশকের অংশ বিশেষ (যেমন, ডিডিটি) কোন কোন মাত্রায় মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে এবং খাদ্যচক্রের মাধ্যমে মৎস্যভূক পাখি ও মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

৬। ক্ষতিকর মাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থযুক্ত পানি ব্যবহার করলে, পানিতে সাঁতার কাটলে, তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত মাছ খেলে, কলকারখানার তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত পানি ব্যবহার করলে মানুষের ক্যান্সারসহ নানা রকম জটিলরোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

৭। তেল দ্বারা পানি দূষণের ফলে আমিষজাতীয় খাদ্য সরবরাহকারী মাছ ও ঝিনুকজাতীয় প্রাণী এবং অন্যান্য জলজ জীব তেলের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেক সময় মারাও যেতে পারে। তেল দ্বারা দূষিত পানিতে চিংড়ির বংশবৃদ্ধি কমে যায়।

৮। পানিতে মিশ্রিত ভারী ধাতু, যেমন- পারদ, সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি প্রাণীদেহে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর মুত্যু ঘটে। পারদ মানব দেহে প্রবেশ করলে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন হয়।

## পানি দূষণের প্রতিকার

নিচে পানি দূষণ থেকে প্রতিকারের উপায়গুলি উল্লেখ করা হলো-

১। শহর ও বন্দরের আবর্জনা ও নর্দমার বর্জ্য নদ-নদী, খাল-বিলে গড়িয়ে পড়ার আগে শোধন করা উচিত।

২। নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যক। নদীর তলদেশে যাতে পলি জমতে না পারে সেজন্য নিয়মিত ড্রেজিং প্রয়োজন।

৩। কৃষি জমিতে জৈব সার এবং পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত। ফলে অতিরিক্ত সার জলাশয়ের পানিকে দূষিত করতে পারবে না।

৪। শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য পাশ্ববর্তী জলাশয় ও নদ-নদীতে পড়ার পূর্বে শোধন করা প্রয়োজন।

৫। খোলা মাটিতে রাসায়নিক দ্রব্য, রং অথবা গাড়ীর তেল কখনও ফেলা উচিত নয়। কেননা এ সমস্ত দ্রব্য মাটি চুয়িয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত করে।

৬। কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছানাশক এর যথেচ্ছা ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

৭। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো বন্ধ করা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

৮। সর্বস্তরের মানুষকে পানি দূষণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন এবং এর প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহ চিত্র জনসাধারণের নিকট তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে জনগণকে সচেতন ও সতর্ক করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

- পৃথিবীর শতকরা তিন ভাগ পানি মিঠা পানি।
- মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নিরাপদ নয়, পানির এমন অবস্থাকে পানির দূষণ বলে।
- পানি দূষণের বিভিন্ন কারণগুলির মধ্যে গৃহস্থালীর বর্জ্য ও কল-কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যই উল্লেখযোগ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মিঠা পানির কত অংশ মানুষের আওতাধীন?
ক) এক-তৃতীয়াংশ
খ) দুই-তৃতীয়াংশ
গ) এক-চতুর্থাংশ
ঘ) অর্ধেকাংশ

২। উদ্ভিদের কোন দুটি পুষ্টি উপাদান পানি দূষণ ঘটায়?
ক) পটাশিয়াম-ক্যালসিয়াম
খ) মলিবডেনাম-ম্যাঙ্গানিজ
গ) নাইট্রোজেন-ফসফরাস
গ) কার্বন-হাইড্রোজেন

৩। নিচের কোনটি মানব মস্তিষ্কে ক্ষতিসাধন করে?
ক) সীসা
খ) তামা
গ) লোহা
ঘ) পারদ

**রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন**

১। পানি দূষণ বলতে কি বুঝায়?

২। পানি দূষণের কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

৩। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলাফল আলোচনা করুন।

৪। পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ উল্লেখ করুন।

## পাঠ ৪ মাটি দূষণ (Soil Pollution)

**ভূমিকা**

পানির অপর নাম জীবন হলেও মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে মাটির প্রয়োজন পানির চেয়ে কোন অংশই কম নয়। পানির মত মাটিও নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। এবং এই দূষণের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাপন ব্যহত হচ্ছে। এই পাঠে মাটি দূষণ আলোচনা করা হবে।

**উদ্দেশ্য**

এ পাঠ শেষে

- মাটি দূষণ কি এবং এর কারণগুলি বর্ণনা করা যাবে।
- দূষণের ফলাফল উল্লেখ করা যাবে।
- মাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করা যাবে।

## মাটি দূষণ (Soil pollution)

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী খ্যাদ্যের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আর এ উদ্ভিদ তথা গাছ তাদের পুষ্টির জন্য মাটির উপর নির্ভর করে। গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান (খনিজ পদার্থ) মাটি থেকে সংগ্রহ করে। তাই মাটি ছাড়া আমাদের খাদ্যের কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয় তার সবগুলিরই উৎস মাটি। আমরা মাটিকে আমাদের জীবনের একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মনে করে থাকি। তবে মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এ মাটির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তথা মাটি দূষিত হচ্ছে।

মাটি দূষণ বলতে বুঝায়- মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান হ্রাস ও অবাঞ্চিত পদার্থসমূহের সঞ্চয়, যা বর্তমান প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের জন্য ক্ষতিকর। অবাঞ্চিত পদার্থ বলতে সেসব উপাদানকে বুঝায়, যা মাটির নেতিবাচক রূপান্তর ঘটায়।

মাটিদূষণ পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান অংশ। নগরায়ন ও ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই মাটিদূষণের প্রধান কারণ। মাটি দূষণের প্রধান কারণগুলি হলো:

১। ভূমি ক্ষয়
২। রাসায়নিক দ্রব্য ও বর্জ্যের স্তুপ
৩। অপরিকল্পিত নগরায়ন
৪। অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষনিধন
৫। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ
৬। চিংড়ি চাষ ও
৭। অনিয়নন্ত্রিত কৃষি কাজ।

নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

### ১। ভূমি ক্ষয়

ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ বৃষ্টি ও বায়ু প্রবাহ। ভূমি ক্ষয় ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় যখন মানুষ নির্বিচারে গাছ-পালা কেটে বন উজাড় করে, তৃণভূমিতে চাষাবাদ শুরু করে এবং মাটির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করে গাছ-পালা কেটে ফেলে ফলে মাটি আলগা হয়, তখন বাতাস সহজে মাটি উড়িয়ে নিয়ে ভূমিক্ষয় ঘটায়। এছাড়া বৃষ্টির পানি দ্বারা উন্মুক্ত স্থানের ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে সৃষ্টি হয় প্রচুর পলির।

জমি চাষের ফলে ভূমি ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়, কেননা জমি চাষের ফলে মাটি আলগা হয় তখন বৃষ্টির পানি ও বায়ুপ্রবাহ সহজেই একস্থানের মাটি অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের উৎস থেকে সাধারণত সবচেয়ে বেশি পলি এসে থাকে। এছাড়া কিছু পলি আসে এমন মাটি থেকে যেখানে কোন গাছপালা নেই।

## ২। রাসায়নিক দ্রব্য ও বর্জ্যের স্তুপ

শিল্প কল-কারখানা থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বর্জ্য হিসেবে নির্গত হয়। এছাড়া গ্রাম বা শহরের গৃহস্থালী বর্জ্য ও নাগরিক বর্জ্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তুপ করা হয়। এ সমস্ত বর্জ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থসহ রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণু থাকে, যা বর্জ্য স্তুপকৃত স্থান ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানকে দূষিত করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ঢাকা শহরের হাজারীবাগের ট্যানারীর কথা। এক হিসাবে দেখা গেছে এখান থেকে গড়ে প্রতিদিন 19000 ঘন-মিটার পানিতে প্রায় তিন শতাধিক বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য দ্রবীভূত অবস্থায় বের হচ্ছে। নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে এ তরল বর্জ্যের অম্ল ও ক্ষারত্বের তারতম্য যথাক্রমে 1.5 থেকে 13.0 pH মাত্রায় থাকে। এ তরল বর্জ্য ট্যানারী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটিকে মারাত্মক দূষিত করেছে, ফলে এ এলাকার মাটিতে জন্মানো ঘাস পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

## ৩। অপরিকল্পিত নগরায়ন

বাংলাদেশসহ গোটাবিশ্বের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এরই সাথে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের শহরমুখী বসবাস। এ কারনে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের শহরের জনসংখ্যা ঘনত্ব দিন দিন বাড়ছে।

1950 সলের পরবর্তী 35 বছরে বিশ্বে শহরবাসী লোকের সংখ্যা 1.25 বিলিয়ন (125 কোটি) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে তিনগুণ হয়েছে। অধিকতর উন্নত দেশসমূহে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে তা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপক সংখ্যক শহরবাসীর চাহিদা পুরনার্থে শহরে গড়ে উঠছে অনিয়ন্ত্রিত পাকা-বাড়ি, সুউচ্চ ফ্লাট বাড়ি এবং যেখানে সেখানে শিল্প কল-কারখানা। এভাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে শিল্প কল-কারখানা ও ফ্লাট বাড়ি উঠাতে দূষিত হচ্ছে শহুরে পরিবেশ। এমনিভাবে অপরিকল্পিতভাবে নগর গড়ে উঠাতে ভেঙ্গে পড়ছে শহরের বর্জ্য নিষ্কাশন ও পয়:নিষ্কাশন। এসব বর্জ্য দ্বারা শহরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি, পানি, বাতাস দূষিত হচ্ছে।

## ৪। অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষনিধন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাতে বৃক্ষকর্তনের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অধিক জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান রাস্তাঘাট, কল-কারখানা তৈরি করতে বনভূমি ও কৃষিজমি ব্যবহার করা হয়, ফলে বনভূমিতে গাছের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং মাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। মাটি উন্মুক্ত হওয়ায় মৃত্রিকা ক্ষয়বৃদ্ধি পেয়ে মাটি তার পুষ্টি উপাদান হারাচ্ছে, তথা মাটি দূষণ ঘটছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষনিধনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেখানে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

## ৫। অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ। যেমন-ফারাক্কা বাঁধ

ফারাক্কা বাঁধের কারনে বাংলাদেশের নদীগুলির নাব্যতা কমে গেছে এবং নদীতে স্রোত কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাগরের লোনা পানি অধিক ভিতরে প্রবেশ করছে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলে মাটির লবণাক্ততা জনিত মাটি দূষণ শুরু হয়ে গেছে।

## ৬। চিংড়ি চাষ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি মূল্যবান রপ্তানীযোগ্য সম্পদ। একারনে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল তথা সাতক্ষীরা, খুলনা ও কক্সবাজার এলাকায় ব্যাপক হারে চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে। চিংড়ি চাষে অনেক দিন লোনা পানিবদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে, লবণাক্ততা জনিত মাটি দুষণ ঘটে।

### ৭। কৃষি কর্মকান্ড

কৃষি কাজে অধিক ফসল ফলনের জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছিটানো হয়, এর দ্বারা মাটি দূষণ ঘটে। যে কোন কৃষি কাজই মাটির পুস্টি উপাদান নষ্ট করে থাকে। মাটি চাষাবাদের সময় মাটি আলগা হয়ে পড়ে এবং মাটিক্ষয়ের মাধ্যমে মাটি দূষণ ঘটে। এছাড়া জমি চাষকালে মাটির কাঠামো নষ্ট হয়। মাটির কাঠামো (বুনট) নষ্ট হলে গাছ জন্মাতে অসুবিধা হয়।

## মাটি দূষণের ফলাফল

নিচের মাটি দূষণের ফলাফল উল্লেখ করা হলো:

১। ভূমিক্ষয়ের ফলে ভুমির উপরিভাগ থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান অন্যত্র সরে যায় ফলে উক্ত জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে, যা গাছ-পালা জন্মানোর অনুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উক্ত এলাকা ক্রমান্বয়ে বৃক্ষ শূন্য হয়ে পড়ে।

২। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ও বর্জ্যের স্তুপ মাটিকে দূষিত করে, ফলে সে এলাকায় কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মাতে পারে না।

৩। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে অন্যান্য দূষণের পাশাপাশি মাটি দূষণ ঘটে, যা মানুষসহ অন্যান্য জীবের বসবাসের অনুপোযোগী হয়। এর দ্বারা মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

৪। ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধনের ফলে ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সেখানে গাছপালা জন্মাবার পরিবেশ নষ্ট হয়, যা মরুকরণকে প্রভাবিত করে।

৫। ফারাক্কা বাঁধের কারনে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলি নদীতে পানির স্রোত হ্রাস পেয়েছে এবং নদীগুলি দিন দিন তাদের নাব্যতা হারাচ্ছে। এর দ্বারা নদী ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি দূষণের ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৬। চিংড়ি চাষের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মাটি লবণাক্ততা জনিত দূষণের স্বীকার হচ্ছে। ফলে সে এলাকার মাটির ঘাস পর্যন্ত মরে যাচ্ছে।

৭। কৃষি কর্মকান্ডের সময় অপরিকল্পিত চাষাবাদ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে। এজন্য জমি থেকে ফসল উৎপাদন হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে।

## মাটির দূষণ নিয়ন্ত্রণ

১। আলগা মাটি সহজে ক্ষয় হয়ে থাকে। এজন্য আলগা মাটিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘাস বা অন্যান্য উদ্ভিদ লাগানা উচিত।

২। ব্যাপকহারে বৃক্ষনিধন বন্ধ করা প্রয়োজন। গাছ কাটার প্রয়োজন হলে পাশাপাশি গাছ লাগাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। নগর বা গ্রামের গৃহস্থালীর বর্জ্য ও সিওয়েজ বর্জ স্থানান্তর পূর্বে পরিশোধিত (recycling) করে নিতে হবে।

৪। অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন বন্ধ করতে হবে।

৫। চিংড়ি চাষের বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৬। কল-কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক বর্জ্য ভূমি, জলাশয় বা নদীতে নির্গমনের পূর্বে পরিশোধিত করতে হবে।

৭। জমিতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার, জীবাণু সার ব্যবহার করতে হবে। জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে শীম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মানো যেতে পারে।

৮। জমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। এর পরিবর্তে জৈব প্রক্রিয়ায় কীট-পতঙ্গ দমন করা যেতে পারে। তাছাড়া জমিতে পর্যায়ক্রমে ফসল চাষাবাদ করলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হ্রাস পায়।

৯। মাটি দূষণ এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

## সারসংক্ষেপ

- মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান হ্রাস ও অবাঞ্ছিত পদার্থসমূহ সঞ্চয়, যা বর্তমান প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের জন্য ক্ষতিকর; মাটির এ অবস্থাকে মাটি দূষণ বলে।
- বিভিন্ন কারনে মাটি দূষণ ঘটতে পারে, যথা- ভূমি ক্ষয়, রাসায়নিক দ্রব্য বা বর্জ্যের স্তুপ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ব্যাপকহারে বৃক্ষনিধন, ফারাক্কা বাঁধ, চিংড়ি চাষ ও কৃষি কর্ম-কান্ড ইত্যাদি।
- পৃথিবীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বসবাস উপযোগ করার জন্য মাটি দূষণ রোধ জরুরী।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১। ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ কি?
ক) চিংড়ি চাষ
খ) বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ
গ) রাসায়নিক সার ব্যবহার
ঘ) নগরায়ন

২। ভূমি ক্ষয়ের ফলে মাটিতে কি অবস্থার সৃষ্টি হয়?
ক) উদ্ভিদ ভাল জন্মে
খ) পুষ্টি উপাদান অপরিবর্তিত থাকে
গ) পুষ্টি উপাদান হ্রাস পায়
ঘ) পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি পায়

৩। দক্ষিণাঞ্চলের চিংড়ি চাষ এলাকায় বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রধান প্রভাব কি?
ক) মাটি দূষণ
খ) শব্দ দূষণ
গ) বায়ু দূষণ
ঘ) নগরায়ন

### রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। মাটি দূষণ বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। মাটি দূষণের প্রধান কারণগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। মাটি দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। মাটি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায়, আলোচনা করুন।

# পাঠ ৫ শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

## ভূমিকা

শব্দ মানুষের ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হলেও শব্দ দূষণ মানুষের মানষিক এবং শারীরিক নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই পাঠে শব্দ দূষণের নানা দিক আলোচনা করা হবে।

### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে

- শব্দ দূষণ কি ও এর কারণগুলো বর্ণনা করা যাবে।
- এর ফলাফল আলোচনা করা যাবে।
- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় কি তা জানা যাবে।

## শব্দ দূষণ (Noise Pollution)

আমরা কথোপকথোনের মাধ্যমে পারস্পরিক ভাব বিনিময় করি। কোন ব্যক্তির কথা তথা উচ্চারিত শব্দ আমরা আমাদের শ্রুতি কোষের মাধ্যমে শুনতে পাই। কিন্তু আমরা একটি নির্দিষ্ট মাত্রার শব্দ শুনতে পাই, অধিক উচ্চশব্দ ও অধিক নিম্নশব্দ আমরা শুনতে পাই না। শব্দের তীক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে শব্দ দূষণ নির্ণয় করা হয়। শব্দ মাপের একক ডেসিবেল (dB, decibel), এটি এক বেল (B, bel)-এর একদশমাংশ। আমরা 20 ডেসিবেল থেকে 120 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ শুনতে পাই। 20 ডেসিবেল-এর নিম্নমাত্রার এবং 120 ডেসি বেল-এর উচ্চ মাত্রার শব্দ শুনতে পাই না। তবে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণমাত্রা 60-75 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ। শব্দের মাত্রা 75 ডেসিবেল অতিক্রম করলেই সেটা শব্দ দূষণের পর্যায়ে পড়ে।

এটা এখন প্রমাণিত যে কেবল বস্তুই পরিবেশ দূষিত করে না, অবস্তুও পরিবেশ দূষণ ঘটাতে পারে যেমন- শব্দ। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বক ইত্যাদির মতো শব্দও এক প্রকার শক্তি। যখন মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতার জন্যে ক্ষতিকর শব্দ সৃষ্টি হয়, তখন সে অবস্থাকে শব্দ দূষণ বলা হয়।

## শব্দ দূষণের কারণ

বিভিন্ন কারনে শব্দ দূষণ হতে পারে, এগুলির মধ্যে যানবাহনের জোরালো হর্ণ, কলকারখানার নির্গত শব্দ, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের শব্দ, যানবাহন চলাচলের শব্দ, অনিয়ন্ত্রিত লাউডস্পিকার ব্যবহার, উড়োজাহাজের শব্দ, আবাসিক এলাকায় কল-কারখানার অবস্থান, প্রচন্ড জনকোলাহল ইত্যাদি শব্দ দূষণের মূল কারণ। গ্রামাঞ্চলেরর তুলনায় শহর এলাকায় শব্দ দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। উদাহরণ হিসেবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ দূষণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকা শহরের স্বাভাবিক শব্দের মাত্রা গড়ে 100 ডেসিবেলের উপরে। পাথর ভাঙ্গার মেশিন ও জেট বিমানের ইঞ্জিনের শব্দের মাত্রা যথাক্রমে 120 ও 130 ডেসিবল। শর্টগানের শব্দের মাত্রা 140 ডেসিবেল। বাজার ও কারখানা, ট্রাক্টর এবং নতুন মোটর গাড়ীর শব্দের মাত্রা যথাক্রমে 90-100 ডেসিবেল, 60-70 ডেসিবেল এবং 95 ডেসিবেল। অবশ্য শুধু কর্মস্থল বা ঘরের বাইরেই নয়, ঘরে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি, যেমন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ফুড ব্লেন্ডার, বাসন ধোয়ায় যন্ত্র, ফুড গ্রাইন্ডার, টেলিভিশন লাউড স্পিকার, পাখা ইত্যাদি থেকেও শব্দ দূষণ সৃষ্টি হতে পারে।

## শব্দ দূষণের ফলাফল

শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১। শব্দ দূষণ মানুষের মানসিক ও শারীরিক অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। শব্দ দূষণে রক্তচাপ ও হৃদকম্পন ব্যাহত হয়, শ্রবণশক্তি কমে আসে, এমন কি বধির হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

২। শব্দ দূষণের ফলে কণ্ঠনালীর প্রদাহ, আলসার, মস্তিষ্কের বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

৩। হঠাৎ উচ্চ শব্দ, যেমন- বোমা বা পটকা ফাটার শব্দ, যানবাহনের তীব্র হাইড্রোলিক হর্ণ মানুষের শিরা ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। এ জাতীয় শব্দ প্রবাহে সাময়িকভাবে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয় এবং পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে বিশেষ হরমোন নি:সৃত হয়, যা রক্তে কোলেস্টরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

৪। তীব্র শব্দের প্রতিক্রিয়ায় অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাডরিনোকটিকোট্রপিক হরমোন নি:সৃত হয়, যা মানসিক অস্থিরতা ও স্নায়ুবিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে।

৫। শব্দের তীব্রতা অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যেমন-বিরক্তিভাব, ক্রোধপ্রবণতা, মানসিক উত্তেজনা, স্নায়বিক দূর্বলতা ইত্যাদি দেখা দেয়। উচ্চ শব্দ যেমন-বিমানের শব্দ শিশুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

৬। বাংলাদেশের বিভিন্ন মানসিক রোগীর একাংশের রোগাক্রান্তের কারণ শব্দ দূষণ। ফ্রান্সের প্যারিসে 70 শতাংশ নিউরোসিস রোগী শব্দ দূষণের কারনে ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের 10 লক্ষ শিশু রক মিউজিক আসক্ত হওয়ায় শব্দ দূষণে বধিরতায় ভূগছে।

৭। শব্দ দূষণের কারনে গর্ভস্থ সন্তান শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

## শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যেটা জরুরী সেটা হচ্ছে বিভিন্ন যানবাহন ও কল-কারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপ করা এবং উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী তথা শব্দ দূষণকারী যানবাহন ও কল-কারখানার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা। উন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন কল-কারখানা থেকে সৃষ্ট শব্দের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপের ব্যবস্থা থাকলেও, আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যা অতি জরুরী।

ঢাকা মহানগর পুলিশ অর্ডিন্যান্স 1978 এর 25 নং অনুচ্ছেদের 'ছ' উপ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাস্তা বা জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে যানবাহনে হাইড্রোলিক হর্ণ, উচ্চ শব্দযুক্ত সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, ঢাক পেটানো ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণ অথবা নিকটবর্তী বাসিন্দাদের প্রতিবন্ধকতা বা বিরক্তি করতে পারে এমন কাজের জন্য পুলিশ কমিশনার তাৎক্ষণিক গ্রেফতারসহ বিধি মোতাবেক যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ এখনও চালু হয়নি। এ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১৯৯৫ সালের পরিবেশ দূষণ সংরক্ষণ আইনের 15 নং ধারার, 1 উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এ আইনের বিধান লংঘন করেন বা এ আইন বা বিধির অধীনে প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি অনুরূপ ব্যর্থতার দায়ে অনুর্ধ্ব 5 বছরের কারাদন্ড বা অনুর্ধ্ব 1.0 লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় ধরনের দন্ডে দন্ডিত হবেন। উল্লেখ যে, উক্ত আইনে শব্দকেও পরিবেশ দূষক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে জানা গেছে এখন পর্যন্ত কোন কর্তৃপক্ষই উক্ত বিধান মতে কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। এ আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা অতি জরুরী।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলি অনুসরণের পাশাপাশি শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, এক্ষেত্রে জাতীয় মিডিয়া বিভাগকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

## সারসংক্ষেপ

- শব্দের তীক্ষ্ণতা মাপার একক ডেসিবেল (dB)। আমরা 20-120 ডেসিবেল মাত্রার শব্দ শুনতে পাই।
- 75 ডেসিবেল এর অধিক মাত্রার শব্দকে শব্দদূষণ হিসেবে ধরা হয়।
- যানবাহনের জোরালো শব্দ, কল-কারখানার নির্গত শব্দ, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের শব্দ, যান-বাহন চলাচলের শব্দ, লাউড স্পিকারের শব্দ, উড়োজাহাজের শব্দ ইত্যাদি শব্দ দূষণের মূল কারণ।
- শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় ধরণের রোগের সৃষ্টি হতে পারে।
- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রনে জাতীয় আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করণের পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। মানুষ কত পরিসরের মাত্রার শব্দ শুনতে পায়?
ক) 50-60 ডিবি মাত্রার
খ) 60-70 ডিবি মাত্রার
গ) 20-120 ডিবি মাত্রার
ঘ) 70-80 ডিবি মাত্রার

২। মানুষের স্বাভাবিক শব্দ শ্রবণ মাত্রা কত ডেসিবেল (ডিবি)?
ক) 60-75 ডিবি
খ) 50-60 ডিবি
গ) 70-80 ডিবি
ঘ) 20-120 ডিবি

৩। জেট বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ মাত্রার কত ডিবি?
ক) 100 ডিবি
খ) 110 ডিবি
গ) 120 ডিবি
ঘ) 130 ডিবি

৪। ট্রাকের হাইড্রোলিক হর্ণের শব্দ মাত্রার কত ডিবি?
ক) 100-110 ডিবি
খ) 110-120 ডিবি
গ) 120 - 130 ডিবি
ঘ) 130 - 140 ডিবি।

### রচনামূলক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। শব্দ দূষণ কাকে বলে?
২। শব্দের মাত্রার প্রকাশের একক কি? আমরা কত মাত্রার শব্দ শুনতে পাই?
৩। শব্দ দূষণের কারণগুলি উল্লেখ করুন।
৪। শব্দ দূষণের বিরূপ প্রভাব উল্লেখ করুন।
৫। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কি করা প্রয়োজন?
৬। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকা মহানগর পুলিশের অর্ডিন্যান্সে উল্লেখিত ধারাটি কি?

# পাঠ ৬ পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি

## ভূমিকা

এই ইউনিটের পূর্বের পাঠগুলিতে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুস্থ্য, সুন্দর, স্বাভাবিক এবং স্থিতিশীল জীবনের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশে আবশ্যকীয়। দূষণমুক্ত পরিবেশ পেতে হলে অবশ্যই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। এই পাঠে পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

## উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে

- পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- পরিবেশ দূষণের কারণগুলি জানা যাবে।
- পরিবেশ সংরক্ষণে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয় কি তার বর্ণনা দেওয়া যাবে।
- পরিবেশ দূষণে করণীয় পদক্ষেপগুলি বলা যাবে।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সবকিছু মিলেই পরিবেশ। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর সবকিছু যেমন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানবনির্মিত অবকাঠামো এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত সমন্বয়ে সৃষ্ট অবস্থাই পরিবেশ।

পরিবেশ মানুষের জন্য তিনটি মৌলিক কাজ করে থাকে।

যথা-

- প্রথমত: বাতাসসহ মানুষের থাকার জায়গা দেয় এবং সেসব আনুষংগিক জিনিসপত্র সরবরাহ করে যা মানুষের জীবনকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করে।
- দ্বিতীয়ত: পরিবেশ হচ্ছে কৃষি, খনিজ, পানি এবং অন্যান্য সম্পদের উৎস যা মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরিহার্য।
- তৃতীয়ত: পরিবেশ মানব সৃষ্ট সব আবর্জনা গ্রহণকারী হিসেবে কাজ করে এবং এর ব্যাপক অংশের পরিশোধন ও নিশ্চিত করে।

মানুষ পরিবেশের একটি অংশ এবং জীবজগতসহ মানুষের জন্যেই পরিবেশ। জীব-জগতের স্বাভাবিক জন্ম, স্থিতি ক্রমবৃদ্ধি ও মুত্যুকে প্রভাবিত করে থাকে পরিবেশ। পরিবেশের সব উপাদান একে অপরের সম্পুরক ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে এবং এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কিন্তু মানব জাতির বিভিন্ন কর্মকান্ড যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনের ভূমিকা রাখতে শুরু করল তখন থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে লাগলো। মানুষ কখনও সচেতনভাবে আবার কখনও সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক স্বার্থে পারিপার্শ্বিকতার কথা চিন্তা না করেই পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টের কাজে জড়িয়ে পড়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের জীবনের সামগ্রিক মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, কিন্তু একই সঙ্গে পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে এ শতাব্দির ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সংঘটিত পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়াবহতম যুদ্ধের কথা। এ দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধে মাত্র ছ'বছরে নিহত হয়েছিল প্রায় পাঁচ কোটি (পঞ্চাশ মিলিয়ন) মানুষ। আহত হয়েছিল আরো বহুকোটি। এ যুদ্ধের প্রয়োজনেই আবিষ্কৃত হয়েছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম মরণাস্ত্র পরমাণু-বোমা। এ যুদ্ধ সরাসরি আমাদের দেশে আসেনি, তবে যেটুকু ছোয়া লেগেছিল তাতেই মানুষের জীবনে নেমে এসেছিল অবর্ণনীয় দু:খ-দুর্দশা; মানব সৃষ্ট দূর্ভিক্ষে প্রাণ দিতে হয়েছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষকে। এ যুদ্ধে মারনাস্ত্র ব্যবহারের ফলে জাপানের হিরোসীমা-নাগাসাকীতে যে পরিবেশ দূষণ ঘটেছিল, তার ক্ষতিকর প্রভাব এখনও রয়ে গেছে।

একবিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ। এ এক মহাযুগসন্ধি! ঠিক এমনি সময়ে খবর সরব হয়ে উঠেছে, জোর আলোচনা চলছে- 'ভঙ্গুর, বিপন্ন পৃথিবীকে নিয়ে। সারা পৃথিবী জুড়ে পরিবেশের সংকট যে ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে এটা আজ আর বিতর্কের বিষয় নয়। প্রথমে বলা হতো এর পিছনে দায়ী ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে ধারণা করা হয় পৃথিবী জুড়ে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়নই মূলত পরিবেশের এ সমস্যার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এটা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, পরিবেশের এ বিপর্যয়ের জন্য শুধু নব্য প্রযুক্তিই দায়ী নহে, এর পিছনে আরো অনেক কারণ নিহিত রয়েছে।

বর্তমানকালে সচেতন মানব সমাজ বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ, গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া, ওজোন স্তরের ক্ষয়, এসিড বৃষ্টি ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে বেশ শংকিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলে পারমাণবিক চুল্লীতে বিস্ফোরণ, ভারতের ভূপালে কীটনাশক কারখানায় দূর্ঘটনা, কয়েক বছর পূর্বে ভারতের প্লেগ মহামারী, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জায়ারে ইবোলা ভাইরাসে শত শত লোকের মৃত্যু, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে পুনর্বার জায়ারে ইবোলা ভাইরাস আক্রমণ এবং সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রায় ৫২টি জেলাতে আর্সেনিক দূষণের ঘটনা অধিকাংশ জনগণকেই উদ্বিগ্ন করেছে।

পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ঘটনা বিশ্বমাত্রিক, যেমন- গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া, ওজোন স্তর ধ্বংস; অন্যদিকে এসিডবৃষ্টি, আর্সেনিক দূষণ, মরুকরণ, ইবোলা ভাইরাস আক্রমণ, প্লেগ ইত্যাদি আঞ্চলিক এবং সুন্দরবন ম্যানগ্রেভ বনাঞ্চলের বিনাশ, বাংলাদেশের মিঠা পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততাবৃদ্ধি ইত্যাদি স্থানীয় বিষয়। পরিবেশ সংরক্ষণ সচেতনতা আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে এখনো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। এমনকি এ শতাব্দির সত্তর দশকের আগে পর্যন্ত বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও তেমন উচ্চ-বাচ্চ্য করেনি; মোটামুটি সত্তর দশকের প্রথম থেকেই এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। মানব সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য বিশ্ব পরিবেশ তথা মানুষের ভবিষ্যত যেভাবে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন পরিবেশ ভারসাম্য সংরক্ষণের সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী এ সচেতনাতার সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণকেও সম্পৃক্ত হতে হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় বিবেচ্য, সেটা হচ্ছে এখানকার অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, মাত্র 40 শতাংশ লোক শিক্ষিত। এ শিক্ষিতের মধ্যে অধিকাংশ নাম-মাত্র শিক্ষিত, যারা সংবাদপত্র পাঠ করে পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভে অক্ষম। এছাড়া গণপ্রচারমাধ্যম (যেমন, রেডিও ও টেলিভিশন) দ্বারা প্রচারিত পরিবেশ সম্পর্কিত ফিচারগুলি সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে মূলত নিম্নলিখিত কারনে,

১) অধিকাংশ লোকজনই রেডিও বা টেলিভিশন কিনতে অক্ষম

২) গ্রামঞ্চলের সর্বত্র বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এখনও পৌঁছেনি।

৩) বৈদ্যুতিক চাহিদা অপ্রতুল ও

৪) প্রচারিত ফিচারগুলির ভাষাগত জটিলতা ও উপস্থাপনার বৈচিত্র্যহীনতা বিপুল জগগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

পরিবেশ সচেতনতার ধারণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ন্যায় প্রাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে এবং গবেষণা ফলাফল প্রবন্ধ ও জনপ্রিয় রচনার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। পরিবেশ সম্পর্কিত গবেষণা আমাদের দেশের তুলনামূলকভাবে কম, তবে কিছু কিছু গবেষণা প্রবন্ধ ও রচনা স্বীকৃত জার্ণাল বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তবে এ সমস্ত প্রবন্ধ বা রচনার অধিকাংশ ইংরেজিতে রচিত। কিছু কিছু প্রবন্ধ বাংলায় প্রকাশিত হলেও, উপস্থাপনার জটিলতার কারনে সেগুলো সাধারণ জনগণতো নয়ই বেশিরভাগ পাঠকের নিকট তেমন কোন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না।

পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, যথা- বিভিন্ন পেশাগত জার্ণালে (গবেষণা পত্রিকা) প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল উক্ত পেশার জনগোষ্ঠীর নিকট সরাসরি সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণপ্রচার মাধ্যম সরাসরি সচেনতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এ মাধ্যমগুলি দেশের সকল মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে না। এজন্য জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাবৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ দ্রুত হার, শহরমুখী অভিগমন ও অপরিকল্পিত নগরায়ন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের ন্যায় আমাদের পরিবেশকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। বর্তমানহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী তিন দশকের মধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তখন ঐ বিপুল জনগোষ্ঠীর নূন্যতম চাহিদা পূরণ করতে আমরা কতটুকু সক্ষম হব। এছাড়া ক্রমাগত শহরমুখী অভিগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভবিষ্যতে শহরগুলি বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে জনগণকে এখনই সচেতন করতে হবে, এর পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাস উপযোগী বিশ্ব বা পৃথিবী রেখে যেতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী।

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে সীমিত পরিমাণ কৃষি জমি দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় চাহিদা মিটাতে কৃষি জমিতে অপরিকল্পিতভাবে ব্যাপকহারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটি দুষিত হচ্ছে, যার ক্ষতিকর প্রভাব পরিবেশের উপর পড়ছে। ব্যাপকহারে ভূ-গর্ভস্থ পানি কৃষি সেচকাজে ব্যবহারের ফলে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। কৃষকেরা ইতোমধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেতে শুরু করেছে, অধিকাংশ শ্যালো মেশিনে পানি পাওয়া যাচ্ছে না। জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। জমিতে শিম জাতীয় উদ্ভিদ (যেমন, ধইনচা) চাষের মাধ্যমে মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া জমিতে রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব কীটনাশক, জীবাণুসার ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক সময় ফসলের পর্যায়ক্রমিক চাষের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের আক্রমণ দমন সম্ভব। এ ব্যাপারে কৃষকদেরকে সচেতন করতে হবে। থানা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

একটি দেশের স্বাভাবিক পরিবেশ অবস্থা বজায় রাখতে শতকরা 25 ভাগ বনাঞ্চল দরকার। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মিটাতে কৃষি জমির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে একই হারে বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী ও অসৎ বন কর্মকর্তা নিয়ম বহির্ভূতভাবে বনের গাছপালা কেটে ফেলছে। জনগণকে গাছ-পালার অর্থকরী দিক ও দেশের পরিবেশ রক্ষায় এদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। আশার কথা হচ্ছে সম্প্রতি সারাদেশের ব্যাপক বৃক্ষরোপন, পরিচর্যা ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোন স্তরের ধ্বংস ও বিনাস-এর প্রভাব বাংলাদেশে এখনও পড়েনি। বিশ্বমাত্রিক পরিবেশ সমস্যা এবং এর জন্য প্রধানত দায়ী উন্নত বিশ্বের দেশগুলি। কিন্তু গ্রীনহাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে হিমবাহের বিগলনে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, যা বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী

এলাকাকে নিমজ্জিত করবে। মধ্যম মাত্রার গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় বর্তমান শতাব্দীর শেষাংশে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্রের পানির নিচে চলে যাবে বলে আশংক্ষা করা হচ্ছে। এছাড়া বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বনাঞ্চল সৃষ্টি তথা- গাছ-পালা রোপনের মাধ্যমে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

এক সময় ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ব্যাপক হারে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহৃত হত। পলিথিন সহজে পচে না এবং মাটির সাথে মিশে না। ফলে মাটি ঝুরঝুরে হয়ে যায়। এ ধরনের মাটি চাষাবাদের অনুপযুক্ত ও অট্টালিকা ধ্বংশের জন্য দায়ী। বর্তমানে পলিথিনের যথেষ্ট ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা খুবই আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে ব্যাপকহারে আর্সেনিক দূষণ দেখা দিয়েছে, যা জনমনে আতংকের সৃষ্টি করেছে। মূলত 1978 সাল থেকেই ভারতের পশ্চিম বাংলার কয়েকটি জেলার পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি এবং জনগনের আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গিয়েছে। এ আর্সেনিক দূষণের কারণ হিসেবে নলকুপের ফিল্টার, রাসায়নিক কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে দায়ী করা হলেও এর স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তবে অধিকহারে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন যে এজন্য অনেকাংশে দায়ী এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

## সারসংক্ষেপ

- পৃথিবীর সবকিছু, যেমন- ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলে বিদ্যমান আলো, বাতাস, পানি, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, সাগর, মানব নির্মিত অবকাঠামো এবং সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত সমন্বয়ে সৃষ্ট অবস্থাই পরিবেশ।
- পরিবেশ ও মানুষ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রাকৃতিক কারনে পরিবেশ দূষণ ঘটলেও, মূলত মানুষেরই কর্মকান্ড এজন্য দায়ী।
- পরিবেশকে সুন্দর, বাস-উপযোগী ও দূষণমুক্ত রাখতে হলে মানুষকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ দূষণকারী কর্ম-কান্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

## বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কতলোক মারা গিয়েছিল?

ক) প্রায় পাঁচ কোটি  খ) প্রায় চার কোটি

গ) প্রায় দশ কোটি  ঘ) প্রায় তিন কোটি

২। ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কত খ্রিস্টাব্দে জায়ারে শত শত লোক মারা গিয়েছিলো?

ক) ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে  খ) ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে

গ) ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে  ঘ) ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে

৩। নিচের কোনটি পরিবেশ দূষণের বিশ্বমাত্রিক ঘটনা?

ক) মরুকরণ  খ) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া

গ) আর্সেনিক দূষণ  ঘ) এসিড বৃষ্টি

## সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১। পরিবেশ কি? পরিবেশ দূষণ বলতে কি বুঝেন?

২। পরিবেশ দূষণে শিল্প কল-কারখানা ও মানুষের ভূমিকা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৩। বায়ু দূষণ কি? বায়ু দূষণের কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৪। বায়ু দূষণের প্রতিক্রিয়া এবং এর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৫। পানি দূষণ কাকে বলে? এর কারণগুলি উল্লেখ করুন।

৬। পানি দূষণের ফলাফল এবং এর প্রতিকার বর্ণনা করুন।

৭। মাটি দূষণ কাকে বলে? মাটি দূষণের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৮। মাটি দূষণের প্রতিক্রিয়া ও মাটি দূষণ থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা করুন।

৯। শব্দ দূষণ বলতে কি বুঝেন? এর কারণ আলোচনা করুন।

১০। শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং এ থেকে পরিত্রানের উপায় বর্ণনা করুন।

১১। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয় পন্থাগুলি উপস্থাপন করুন।

১২। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোন স্তরের ক্ষয় পরিবেশের উপর কি কি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে? আলোচনা করুন।